Interview details

Interview with Pintu Das

Interviewed by Soumita Mazumder.

সৌমিতাঃ আচ্ছা তোমার নাম এবং তুমি কি কর সেটা যদি আমাদেরকে একটু বল।

পিন্টুঃ আমার নাম পিন্টু দাস। আমি বর্তমানে সেন্টর ফর স্টাডিস ইন সোশ্যাল সায়ন্সে, এম. ফিলের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।

সৌমিতাঃ আচ্ছা তুমি ছেলেবেলা থেকে তোমার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে, বাবা-ঠাকুরদা, পূর্ববঙ্গের যে ধরনের কাহিনী বা গল্প শুনেছ - সেটা যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার কর।

পিন্টুঃ হ্যাঁ আমার বাড়ি হচ্ছে সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমাতে এবং যে পুলিশ স্টেশন হচ্ছে বারোখানা দ্বীপ নিয়ে গঠিত এবং সুন্দরবনের যেটা ইউনিক ফিচার সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে যে সুন্দরবনটা আছে সেটার মধ্যে বারোখানা আইল্যান্ড দিয়ে এই স্টেশনটা। এছাড়া আর কোনো পুলিশ স্টেশন কিন্তু বারোখানা আইল্যান্ড নিয়ে নেই। বেসিক্যালি মানে আমরা যে বাঙাল, আমরা যে ওপার থেকে এসেছি এই জ্ঞানটা হতে হতে আমার বেসিক্যালি অনেক সময় লেগেছে। আমি অন্তত জানতে পারিনি আপাতত উচ্চমাধ্যমিক দেওয়া বা গ্রাজুয়েশনের আগে। যখন খুব ছোটবেলায় ছিলাম, ছোটবেলায় যখন স্কুলে যেতাম, যখন অন্য কোন কমিউনিটির সঙ্গে মেলামেশা করতাম, সেখানে শুনতাম বাঙাল নামে খুব ডিশক্রিমেনেশন হতো। মানে আমরা বাঙাল, মানে আলাদা কোন কমিউনিটি হিসেবে বসবাস করছি, আমাদের চিন্তাধারাগুলো, আমাদের উন্নয়নের চিন্তাধারাগুলো, আমাদের সংস্কৃতি,

আমাদের খাদ্যাভ্যাস - পুরোটাই ডিফারেন্ট এবং যখন স্কুলে যেতাম অনেক টিটকিরি শুনতাম, কষ্ট লাগতো মনে, ভীষণ কষ্ট লাগতো বাঙাল বলা হতো - আমরা পড়াশুনায় মানে এতোটা ভালো নই, মানসিক ভাবে খুব উত্তেজিতও এবং যেহেতু আমরা একটা আইল্যান্ডের খুব একটা ছোট্ট একটা মৌজাতে বসবাস করি, মানে প্রশাসনিক স্তরের যে মৌজা - সে একটা ছোট্ট একটা মৌজাতে আমরা দলবদ্ধ ভাবে বসবাস করি। সুতরাং সেই কারণে আমরা মানে জনসংখ্যার দিক থেকেও ওই আইল্যান্ডে খুব কম সংখ্যক। সেদিক থেকে আমরা মানে অর্থনৈতিক দিক থেকে যেমনি, তেমনি সংস্কৃতির দিক থেকে পুরোটাই পিছিয়ে ছিলাম। সে যখন আস্তে আস্তে আস্তে আস্তে বড় হই, মানে আমার এম. ফিল.–এর ডেসার্টেশন পেপার যার জন্য আমি ফিল্ডওয়ার্কে যাই, সেই ফিল্ড ওয়ার্কের ক্ষেত্রে আমি যেটা জানতে পারি যে আমার ওই মৌজাটাকে নিয়ে ফিল্ড ওয়ার্কের এথনোগ্রাফিক্যাল কাজটা শুরু করি। সেখানে আমি টোটাল ওই রিফিউজি যাকে বলা হচ্ছে, আমরা আদপে রিফিউজি কি না, বা আমরা কিভাবে ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছি, বা বাবা বা ঠাকুরদা বা মা-বাবার ইতিহাসটা কি, তাদের এখানকার পরিবেশটা কেমন ছিল, তারা যখন ওপার বাংলা থেকে আসে এপারে সেই পরিবেশটা কেমন ছিল কেন ওদেরকে আসতে হল, ওরা কি ইচ্ছে করে এসেছিল নিজের দেশ ছেড়ে নিজের ভিটে মাটি ছেড়ে নিজের গ্রাম ছেড়ে বন্ধু বান্ধব আত্মীয়-স্বজন, নাকি কোন একটা ক্ষমতা কোন একটা ক্ষমতাবলয় নাকি কোন একটা কমিউনিটি কোন একটা ধার্মিক বলয় - নাকি এইসব ঘটনাগুলো বাধ্য করেছিল ওদেরকে এখানে আসতে। এই প্রশ্নগুলো আমার কাছে ভীষণ ভাবে মাথাচাড়া দেয়। এবং এটা দেখতে দেখতে আমি যখন স্থানীয় ওখানকার কিছু মানুষ যারা রয়েছেন – যাদেরকে সরকার রিফিউজি হিসেবে, উদ্বাস্তু হিসেবে পরিচয় দেয়ে, যদিও এখানকার অনেক বড় পলিটিক্স রয়েছে - কাকে রিফিউজি হিসেবে আই-কার্ড দেওয়া হয়েছে, আইডেন্টিটি কার্ড, কিন্তু সেই এলাকাটা আবার কিন্তু গভর্নমেন্টের ম্যাপে সেই এলাকাটা কিন্তু রিফিউজি এলাকা বলে নেই। আমি একজনের ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম - জীবন পোদ্দার যিনি বলেছিলেন আমাকে যে

উনি ওনার সাত বছর বয়সে এপাশে ভারতবর্ষে আসেন এবং কিভাবে আসেন, সেখানে একটা ধার্মিক ব্যাপার ছিল। সেই ধর্মীয় যে কমিউনিটি স্টোরি সেটা হচ্ছে এরকম - যে যারা চট্টগ্রাম এবং বরিশাল এই দুটো অঞ্চলের বেশি মানুষ আমাদের ওই মৌজাতে আসে, বসবাস করে। চট্টগ্রামের মানুষ যারা একটু শহর লাগোয়া ছিল তারা একটু বেশি অর্থনৈতিক দিক থেকে একটু বেশি স্বনির্ভর ছিল। থাকার ফলে তারা কি হচ্ছে তারা সেখানে বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং ওরা একটা দলবদ্ধভাবে ওখানে বসবাস করত। মুসলিম মানুষ এবং হিন্দু মানুষ এককভাবে বসবাস করত। সেক্ষেত্রে কি হয়েছে, খুব আগে থেকে ধরে নিন ওই ১৯১২, ১৩, ১৪ এই সময় যারা আপার ক্লাস হিন্দু মানুষ ছিল তারা কিন্তু লোয়ার ক্লাস মানে একদম যারা লোয়ার ক্লাস মুসলিম যারা মানে একদম যাদের অর্থনৈতিক খুবই খারাপ, যারা একদম শ্রমিক - তাদেরকে অচ্ছ্যুত মানে এইভাবে তারা দেখত। তাদের বাড়িতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করত এবং বাড়িতে কাজ করে তাদেরকে বাইরে খাবার দেওয়া হত কলাপাতাতে এবং বাড়ির যে মহিলা, ভদ্রমহিলা ছিলেন তিনি ওই কলাপাতা যখন সরিয়ে রাখতেন তাকে আবার পুরো স্নান করে আসতে হতো, ঘর ধুতে হতো বা কখনো তুলসী জল বা গোবর জল দেওয়া হতো। এটা হতে হতে আসতে আসতে মুসলিমদের মনে একটা ক্ষোভ আসে। ঠিক তার পরবর্তী সময় যেটা ওনার কাছ থেকে শুনি আমি উনিশ ছেচ্ছল্লিশ-সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ এই সময়টাতে যখন বাংলাদেশে রায়ট শুরু হয়, যদিও ওই অঞ্চলে একটু আপার ক্লাস বসবাস করত হিন্দু মানুষ তাই ওখানে সরাসরি আসতে পারেনি। নিম্নবিত্ত যারা হিন্দু মানুষ ছিল সেখানে এই ঘটনাটা চরমভাবে দেখা যায়, আসতে আসতে মুসলিম মানুষেরা একটা - ওই যে তাদের জমানো ক্ষোভ, তাদের প্রতি যে লাঞ্ছনাটা, যে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য - এই ক্ষোভটাকে ওরা বহিঃপ্রকাশের একটা পর্যায়ে নিয়ে আসে। এবার বিভিন্ন রকম সেখানে পলিটিক্স রয়েছে, তাদের বক্তব্য আমি যেটা শুনেছি। বিহার থেকেও অনেক মুসলিমকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ওখানে অনেক গল্প করা হয়ে যে ওখানে সমস্ত মুসলিমদেরকে কেটে ফেলা হচ্ছে, নদীর জল লাল করে দেওয়া হচ্ছে মুসলিম রক্তে- সুতরাং ইন্ডিয়া মানে ভারতবর্ষকে, মানে

ভারতবর্ষ যেহেতু তখন ভাগ হয়নি, বিহার এইসব অঞ্চল থেকে প্রচুর মুসলিম গিয়ে আসতে আসতে হিন্দুদের প্রতি একটা অত্যাচার শুরু হয়।এবং অত্যাচারটার তিনি কারণ আছে বলে তিনি মনে করেন। কি কারণ? প্রথমে যেভাবে ওনাদেরকে, মুসলিমদেরকে মানে নিম্ন মুসলিম যারা ছিলেন তাদেরকে যেভাবে তুচ্ছ্য তাচ্ছিল্য করা হয়েছে তার বহিঃপ্রকাশ বলে তিনি মনে করছেন এটা। এবং এটাকে উনি দায়ী করছেন তৎকালীন যারা আপার ক্লাস হিন্দু মানুষ ছিলেন- ব্রাহ্মণ বা এই ধরনের জমিদার বা এই ধরনের মানুষকে তারা কিন্তু... তিনি দায়ী করছেন। এবার চলে প্রচণ্ড লেভেলের একটা রায়ট চলে এবং কোনো বাড়ি থেকে রাতের বেলা মহিলাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কিছু মহিলাকে... কাউকে কেউ স্কুল দিয়ে যাচ্ছে কোন হিন্দু ছেলে তাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে মুসলিমরা- এভাবে তারা অত্যাচার শুরু করে। করতে করতে তারা কোন একটা দিন থাকতে না পেরে, বসত বাড়ি ছেড়ে তারা চলে আসতে বাধ্য করে। তারা একথা বলে যে আমরা বেঁচে আছি তা মুসলিমদের জন্য এবং যা ক্ষতি হয়েছে তাও মুসলিমের জন্য। কেমন এই গপ্পটা? এই গপ্পটা এরকম যে- মানে কিছু কিছু মুসলিম মানুষ ছিল যে এত ভাল সম্পর্ক যে এটা মুসলিম না হিন্দু না কি আমি জানতাম না, নিজের ভাই না নিজের বাবা বা নিজের একদম রক্তের সম্পর্ক বলে মনে করতাম। সেই ক্ষেত্রে যে খুব বিপদ এর ক্ষেত্রে যখন দেখা যাচ্ছে যে ওইদিক থেকে রায়ট হয়ে আসছে মানে মুসলিম কমিউনিটির মানুষ হিন্দু কমিউনিটির মানুষকে আক্রমণ করতে আসছে তখন হয়তো কোন মুসলিম মানুষ তাদেরকে রক্ষা করেছে, তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছে। সুতরাং এরকম বহু গল্প আছে। আমি চার থেকে পাঁচ জনের ইন্টারভিউ যে নিয়েছি তারা প্রত্যেকে এই কথা বলেছেন - যে আমাদের যা ক্ষতি হয়েছে সেটা মুসলিমের জন্য, এবার তার কারণও রয়েছে বলে মনে করে এবং যে বেঁচে আছি আমি, হয়তো অনেকেই মারা গেছে কিন্তু আমি যে বেঁচে আছি সেটাও কিন্তু মুসলিমের জন্য।

সৌমিতাঃ আচ্ছা তুমি যে বলছিলে যে তোমার গ্রামের দাঙ্গা বিধ্বস্ত একটা সম্প্রদায়ের তুমি একটা ছবি তুলে ধরছিলে তোমার কথায় - এখন তুমি যদি আমাদেরকে বল যে তোমার পরিবার কোথা থেকে কি পরিস্থিতে এপারে এসে বসবাস করতে শুরু করে?

পিন্টুঃ মানে বর্তমান ভারতবর্ষের যেখানে আমরা বসবাস করি এবং যেই কমিউনিটিতে আমরা বসবাস করছি, খুব যে বেশি হলে সাড়ে তিনশো থেকে তিনশো পঁচাত্তরখানা পরিবার সেখানে বসবাস করছে। এবং তখন ওরা ছিল একশো পঁচাত্তর কি একশো আশি এরকম পরিবার তারা ছিল, কিন্তু এসেছিল আড়াইশোরও উপরে পরিবার। যখন এখানে এসে নেহরু গভর্নমেন্টের প্রতিশ্রুতি পালন হয়নি এবং তার পরবর্তী সময় বহু ক্ষেত্রে রোগ ব্যাধি হয়ে ম্যালেরিয়া, ডাইরিয়া হয়ে মারা যায় অনেক পরিবার। এটা তো পরের গল্প কিন্তু যে গল্পটা আমি পেরিয়ে এসেছি সেটা হল যে এরকম যে আমার পরিবার ওখানে থাকত নোয়াখালিতে যেটা আমি আমার ঠাকুমা ঠাকুরদার কাছ থেকে শুনেছি। নোয়াখালির চর যেগুলো আছে সেই চরগুলোতে বসবাস করত। ঠাকুরদার বাড়ি যেটা ছিল পোদ্দার... অনেকগুলো বাড়ির নাম শুনতাম... পোদ্দার ফ্যামিলি পোদ্দার ফ্যামিলি... তো সেই ফ্যামিলির তারা হচ্ছে পুঁজিবাদী বেসিক্যালি, তো তেনার নিরাপত্তার জন্য তিনি কি করতেন? তেনার যে বাড়ির যে বাউন্ডারিটা সেই বাউন্ডারির ধারে ধারে কিছু পরিবারকে বসতি করতে দিয়েছিল এই কারণে যে তার নিরাপত্তার জন্য। তো আমার পরিবার ঠিক এরকম একটা পরিবার থেকে বিলং করছে। আরেকটা কথা যেটা ওরা বলতেন বা বলেছেন, যেটা আমার বড় জেঠু বলেছেন, ঠাকুমা ঠাকুরদা তো আজ আর বেঁচে নেই। বড় জেঠু বলছেন তিনি খুব ছোট ছিলেন, চার বছর কি পাঁচ বছর হবে হয়তো তখন। মানে প্রত্যেক দিন রাতের বেলায় শুনছেন যে ওই গ্রামে নির্যাতন চলছে, ওপাশ থেকে চিৎকার চলছে, ওপাশ থেকে ঘরের পর ঘর আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোন একটা নদীতে একটা বাচ্চা ছেলের লাশ পাওয়া যাচ্ছে, কোন একটা মহিলাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে মানে চলে গিয়েছে, স্কুলে যেতে যেতে

কোন একটা বাচ্চাকে মানে স্কুল থেকে মানে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে চলে গেছে - তো এবং ঠিক এটা ঘটতে ঘটতে তাদের মধ্যে একটা আতঙ্ক গড়ে ওঠে এবং বাংলাদেশে যেটা হতো যে মুসলিম এবং হিন্দু খুব কাছাকাছি বসবাস করত মানে এমন নয় যে অনেক দূরে মুসলিমরা বসবাস করছে তাদের মাঝে একটা গ্যাপ এবং এখনে হিন্দু বসবাস করছে - ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। যেটা ওনারা পিকচারটা তুলে ধরেছেন আমার কাছে - একদম পাশাপাশি বাড়ি, এরকম অনেক পরিবারে এটা আছে যে যখন কোন মুসলিমরা আসছে এদিকে মারার জন্য বা তাড়ানোর জন্য, বাংলাদেশ থেকে তাড়িয়ে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেবে বা হিন্দু রাখবে না ওই দেশে - কোন কোন মুসলিম কিন্তু এই ধরনের হিন্দুদের প্রোটেকশন দিয়েছে, ওদেরকে পুরোপুরি নিরাপত্তা দিয়েছে। এদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে, হিন্দুদের নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে ওদের পরিবারকে একটা চ্যালেঞ্জ নিতে হয়েছে। ঠিক যখন তারা চ্যালেঞ্জ নিতে নিতে, ফাইট করতে করতে তাদের কমিউনিটির মধ্যে আর পারল না, ঠিক ওই সময় ওরা কি করল? ওরাই সহযোগিতা করল, যাতে এরা ভারতবর্ষে এসে একটু নিরাপত্তাভাবে বসবাস করতে পারে। ঠিক এরকম একটা পরিবার আমার ফ্যামিলি। আমার ঠাকুরদার চার ছেলে চার মেয়ে। তার মধ্যে ওখানে এক ছেলে এক মেয়ে হয়েছে, বাদবাকি ছয় জন এখানে হয়েছে। আমার বাবার জন্মও এখানে বড় পিসিমাকে ওখানে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বড় পিসিমার ঘরে তিন ছেলে এক মেয়ে হয়েছে, এক ছেলে এক মেয়ে এখনও পর্যন্ত ওখানে। পিসিমা মানে আমার যে বড় পিসিমা উনিও ওখানে ওনার তিন ছেলে মেয়েকে রেখে আর এক ছেলে এক মেয়েকে এখানে নিয়ে এসেছে। তো এরকম একটা জায়গাতে যখন ওদের কাছে গল্প শুনি যে তাদের হতাশাটা বা ওখানকার দৈনিক জীবনের পরিবেশ, মেলামেশা, গ্রামের পরিবেশ, তাদের স্বতঃস্ফূর্তটা, তাদের খাদ্যাভাস, চাষবাস, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক - এটা এখানকার থেকে অনেক ভাল ছিল, তারা সেটাকে অনেকটা নিষ্পাপ এবং একটা নিঃশ্বাস ফেলতে পারত। এখানকার পরিবেশটা যেন ওদের কাছে অনেকটা জটিল। মাটি যেন অনেকটা শস্য উৎপাদন কম করে। মানুষের মধ্যে মানুষের সাথে

সম্পর্কটা অনেকটাই মানে কঠিন। সুতরাং এরকম একটা জায়গা মোটামুটি ওদের কাছে গল্পগুলো শুনি আর কি।

সৌমিতাঃ আচ্ছা তুমি বলছিলে যে তোমার ঠাকুরদারা যখন এখানে চলে এলেন, এখানে এসে কোন জায়গায় তারা সেটল্ করে?

পিন্টুঃ এখানে একটা অদ্ভুত একটা গল্প রয়েছে। উন্নিশ বাহান্ন তিপান্ন সাল নাগাদ নেহেরু গভর্নমেন্ট ডিক্লায়ার করে যে যারা ওপার বাংলা থেকে আসবে তাদের কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। এবং একদিকে তারা ওপারে থাকতে পারছে না, পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, যেখানে যেকোনো মুহূর্তে একটা ভয়ঙ্কর কিছু হতে পারে, যা পেয়েছে সঙ্গে - থালা, বাসন, জামা কাপড়, একটু ওই তিলের নাড়ু যাতে ট্রেনে আসতে, বাসে আসতে দেরি হলে, জাহাজ আসতে দেরি হলে ছেলে মেয়েদের খেতে দিতে পারে। খুব বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে ছিল, দু বছর তিন বছর বয়সে তারা এসেছে - জীবনে খুব বাজী রেখে, মানে পায়ে হেঁটে তারপর জাহাজ তারপরে আবার জাহাজ, তারপরে ট্রেন, তারপরে এখান থেকে আবার কল্যাণী। মানে শিয়ালদহ এসেছিল, শিয়ালদহ থেকে আবার কল্যাণীতে নিয়ে গেছে। কল্যাণীর হচ্ছে গয়েসপুরে। ওখানে আগে নাকি মিলিটারি ক্যাম্প ছিল, প্রায়ে সাতাশ হাজার ক্যাম্প ছিল সেখানে। সেই কাম্পে, সেই সাতাশ হাজার কাম্পে প্রায় না হলেও তিন লক্ষ বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষ ছিল। হাওড়া থেকে আসছে, শিয়ালদহ থেকে আসছে এবং সেখান থেকে লরি ভরতি করে করে ভারত সরকার তাদেরকে কল্যাণীতে নিয়ে যায়। কল্যাণীতে গয়েশপুর। প্রথমত নয় মাস বিভিন্ন এন জি ও, বিভিন্ন সংস্থা, ক্লাব সরকারি ওদেরকে খেতে দেয়, সেখানে অস্থায়ী বাথরুম তৈরি করে দেওয়া হয়, যেটুকু সম্ভব হয় বেঁচে থাকার জন্য, যেটুকু সম্ভব হয় আর কি। সেই দিন ছিল এভাবে নয় মাস করে। তারপরে সরকার ওখানে রেশন দেওয়া শুরু করে। রেশন দিত ওটাই, রেশন দেওয়া অবস্থায় আরো এগারো মাস থাকে এবং মানে রেশন দিচ্ছে এবং প্রতি সপ্তাহে প্রতি জনের পিছু সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা

করে দিত বাজার খরচের জন্য। তারপরে এখানে প্রায়ে দু বছর হয়ে যাবার পরে ওখান থেকে গভর্নমেন্ট কি করছে আস্তে আস্তে তাদেরকে বলা হচ্ছে যে কে কোথায় যাবে বেছে নাও - আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, দন্ডকারণ্য আর হচ্ছে সুন্দরবন। সুন্দরবন মানে যেটা হচ্ছে মানে বলা হচ্ছে মথুরাপুর। লক্ষিকান্তপুরের খুব কাছাকাছি জায়গা মথুরাপুর এবং তাদেরকে তখন ভিডিও দেখানো হচ্ছে যে এটা হচ্ছে মথুরাপুর, এটা হছে নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ, এটা হচ্ছে দন্ডকারণ্য। দন্ডকারণ্যে গেলে এই ধরনের সুযোগ সুবিধা পাবে, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে গেলে এই সুযোগ পাবে এবং সুন্দরবনে গেলে এই ধরনের সুযোগ সুবিধা পাবে। এই তিনটে জায়গার মধ্যে যে যেটাকে পছন্দ করবে তারা সেখানে আস্তে আস্তে রওনা হওয়া শুরু করল। এবার এই রওনা হওয়াটা সরকারি পদ্ধতিতে ছিল। গয়েশপুর থেকে কোন একটা পদ্ধতির মাধ্যমে তাদেরকে হাওড়া নিয়ে আসে। সেখানে প্রায়, আমার কমিউনিটি যারা ওখানে বসবাস করেছে প্রায় আড়াইশো মতো ফ্যামিলি ছিল। ওখানে যারা ওখানে বসবাস করছে আড়াইশো জনের মধ্যে জাহাজ পায়নি বলে গভর্নমেন্ট আবার দেড় মাস ওখানে স্টপ করে রেখে দেয় হাওড়া স্টেশনে আড়াইশো ফ্যামিলিকে। তবে তারা কিন্তু খাবারের জন্য অভাব বোধ করেনি, কেননা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্লাব, বিভিন্ন সংস্থা, সরকারি ত্রাণ তহবিল বিভিন্ন সময় এসেছে ওদের খাবার এবং নিত্যদিনের যেগুলো - যা কিছু প্রয়োজন তারা পেয়েছে সেটা। এবার দেড় মাস পরে ওই জাহাজে যখন উঠল তাদেরকে দেখানো হয়েছে মথুরাপুর। এখনকার মথুরাপুরের পিকচারটা অনেকটা মফস্বলের কিন্তু গল্পটা হছে এরকম ব্যাপার - রাতের বেলা ওদেরকে হাওড়া থেকে জাহাজে ছাড়ে গঙ্গা নদী দিয়ে। ছেড়ে ঠিক আমার এখন যেখানে আইল্যান্ড, মানে যদি দেখা যায় একদম প্রত্যন্ত, একদম লো ল্যান্ড একটা এরিয়া, যেখানে কিছু বছর আগেও হয়তো মানে একশো কুড়ি পঁচিশ বছর আগেও হয়তো নদীর তলায় মানে জলের তলায় ছিল। সেটা আস্তে আস্তে চর হয়ে হয়ে, পলি জমে জমে একটা ল্যান্ড তৈরি হয়েছে। যেটা আমি আগেও বলেছি যে ইন্ডিয়ান সুন্দরবনের মধ্যে একমাত্র বারোখানা আইল্যান্ড নিয়ে গঠিত আমার ওই পুলিশ স্টেশন - পাথরপ্রাতিমা পুলিশ স্টেশন এবং আমরা

বসবাস করছি জি প্লট আইল্যান্ডে, জি প্লট আইল্যান্ডটা হচ্ছে মানে একদম বে অফ বেঙ্গল স্পটে। মানে এরকম একটা জায়গাতে আমরা বসবাস করতে শুরু করি। প্রথম যখন ওদেরকে জাহাজে তোলে মানে ভোরবেলা যখন জাহাজে তোলে তখন ওই জায়গাটা একটু উর্বর ছিল, গাছ-ফল-মূল, গাছগাছড়া ঠিক বাংলাদেশের মতো ছিল। ওরা ভাবল যে – বাহ বেশ ভাল, এখানে থাকতেই পারি আমরা, কোন অসুবিধা নেই, ভাল জায়গা, উর্বর মাটি, চাষবাস করব, খাব-দাব, নদী পাশে আছে - যেটা বাংলাদেশ মানুষের হতো আর কি। বেশ আনন্দে আছে। কিছুদিন পর ওখান থেকেও গভর্নমেন্ট মানে তখন কালেক্টর ছিল - সরকারি নির্দেশ, বলল, তোমাদের এটা জায়গা নয় থাকার। তোমাদের জায়গাটা হচ্ছে আরও উত্তরে। মানে আইল্যান্ডের আরও উত্তরে মানে যেখানে জঙ্গল। একদম পুরোপুরি জঙ্গল। নদী বাঁধ ছিল না। এমনও তারা বলেছে যে বাঘের থাবা, বাঘের পায়ের ছাপ তারা দেখেছে। বাঘকে তারা চোখে দেখেনি কিন্তু থাবা তারা দেখেছে। সেখানে সরকারি তত্ত্বাবধানে নদী বাঁধ তৈরি করা হল, সেই নদী বাঁধের ক্ষেত্রে ওই স্থানে মানুষকে যারা মানে স্থানীয় মানুষ মানে যারা ওখানে গেছে রিফিউজি হিসেবে নেহেরু সরকার তো অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল - তোমাদেরকে এই... প্রথম দেখানো হয়েছিল মথুরাপুরে। কিন্তু মথুরাপুরে রাখেনি। নিয়ে যাওয়া হয়েছে মথুরাপুরের মতো এরকম গাছ-গাছারা জমি রয়েছে সুন্দরবনের একদম মানে একদম বে অফ বেঙ্গল স্পটে একটা আইল্যান্ডে। এবং ওই আইল্যান্ডের মধ্যে সব থেকে ভাল জায়গা, উর্বর জায়গা সেখানে নিয়ে গেছে। সেখানে গিয়েও তারা খুশি - যে মথুরাপুর না হলেও আমাদের এই জায়গাটা ভাল, সেটার নাম হচ্ছে বুড়া-বুড়ির তট। জায়গাটা উর্বর বালি, মানে দোয়াঁসে মাটি, ফল-মূল, গাছ-গাছারি, একটু বাজার মতো জায়গাটা রয়েছে, উঁচু জায়গা রয়েছে। আমরা এখানে বসবাস করতে পারি। পাশে নদী আছে, খাব-দাব, চাষ বাস করব, নদীর মাছ ধরব, খাবো। কিছুদিন পরেই সরকার বলছে - তোমাদের এটা থাকার জায়গা নয়। তোমাদের আরেকটু উত্তরে যেতে হবে, ওই আইল্যান্ডেরই। ওরা আসলো, মানে কিছু জনকে পরিবারের ওখানে রেখে দিয়ে এসে দেখল যে পুরোটাই জঙ্গল, মানে পুরো জঙ্গল, নদী বাঁধ তাও নেই। কিছু

করার নেই, জীবনে বাঁচার তাগিদে তারা ওই জঙ্গল কেটে আস্তে আস্তে সরকারি তত্ত্বাবধানে, কিছু সরকারি রিলিফ ফান্ড দেওয়া হচ্ছে - মানে চাল, গম, যব এইগুলো দিয়ে সরকার কি করছে - এক বিঘে প্রতি... একটা ফ্যামিলি যদি... এক বিঘে প্রতি এত টাকা দেওয়া হবে গাছ কাটলে। তিন টাকা, চার টাকা, দু টাকা, আড়াই টাকা এভাবে দেওয়া হবে। এভাবে গাছ কেটে কেটে কেটে একটা ল্যান্ড তৈরি করে ফেলল তারা। তারপরে সেখান থেকে একটা নদী বাঁধ তৈরি হল। এভাবে আস্তে আস্তে বসবাস শুরু হল। তারা দেখল যে কোনোভাবে ধান সংগ্রহ করে বা কোন বীজ বপন করে, অন্যান্য শস্যের বীজ সংগ্রহ করে - আর তো লাঙ্গলও ছিল না তখন, পুরোটাই উদ্বাস্তু। তারা সেখানে বীজ ছড়াতে শুরু করল। দেখল যে আশেপাশে ধান হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে সরকার ওখান থেকে নিয়ে এসেছে। এবার ওই যে ল্যান্ডটা যেটা আগে জঙ্গল ছিল, তার পাশে একটা বড় পুকুর কাটে - প্রায়ে ধরো তিন থেকে চার বিঘা একটা পুকুর কাটে। পুকুর পাড়টাকে উঁচু করে দেওয়া হয় এবং সেখান থেকে এখানে - ওই যখন হাওড়া স্টেশন থেকে ওদেরকে এখানে পাঠানো হয় জাহাজে, প্রত্যেক ফ্যামিলি প্রতি ঘর করার জন্য কিছু কাঠ - শাল কাঠ বা সেগুন কাঠ কিছু দিয়েছিল এবং টিন দিয়েছিল ওদেরকে যাতে ওরা এখানে এসে ঘর করে থাকতে পারে। সেই টিনগুলো ওদের প্রত্যেকটা ফ্যামিলির সাথে ছিল। টিন এবং বাঁশ, কাঠ দিয়েছিল। ওই যার নাম এবার ট্যাঙ্ক পুকুর... ট্যাঙ্ক পুকুর আর কি। ওখানকার স্থানীয় ভাষায় ওর নাম ট্যাঙ্ক পুকুর। খুব বড়। সেখানে থাকতে থাকতে - টিউবওয়েল ছিল প্রায় না হলেও দু কিলোমিটার দূরে একটা টিউবওয়েল ছিল, মানে জল খাবার যে কল সেটা প্রায় দু কিলোমিটার দূরে ছিল। এবং এই দু কিলোমিটার দূরে যেটা প্রথম বললাম যে তটের বাজার, যেখানে এখন আছে সেখান থেকে প্রায়ে দু কিলোমিটার দূরে সেখানে ডাক্তার থাকতো। যদি কোন রোগ ব্যাধি হতো ডাক্তার আটটার সময় আসত, মানে তার আগেও আসতে পারত না আর ঠিক তিনটে - সাড়ে তিনটে হল তখন চলে আসবে কেননা এর মধ্যে তো জল তো এটা। তারা তাকে পুলিশি প্রোটেকশন দিয়ে বা সরকারি হেফাজত দিয়ে সেই ডাক্তারকে কোথাও

রাখতে হতো। কিন্তু এভাবে হতে হতেই আড়াইশো ফ্যামিলিতে কখনো ম্যালেরিয়া, কখনো ডাইরিয়া এসব শুরু হয়। এই করে করে খুব না হলেও প্রায় সত্তর থেকে আশি জন মারা যায় ওখানে। এরকম মারা যাবার পরে হরিনারায়ণ চক্রবর্তী, যিনি বাংলাদেশের ত্রিপুরা বলে একটা অঞ্চল আছে, যেখান থেকে এসেছেন হরিনারায়ণ চক্রবর্তী - তিনি ওখানকার কিছু মানুষকে নিয়ে তখন আমাদের মহকুমা ছিল ডায়মন্ড হারবারে, এখন মহকুমা হয়েছে কাকদ্বীপ। ডায়মন্ডে উনি প্রায় দেড়শ জন মানুষকে নিয়ে আসেন ওই কালেক্টরের সাথে দেখা করতে। যে আমাদের যেভাবে বলা হয়েছে, আমাদের মথুরাপুর দেখানো হয়েছে, কিন্তু মথুরাপুর দেওয়া হয়নি এবং নেহেরু সরকারের যে যে প্রতিশ্রুতি আমাদের দেওয়া হয়েছিল সেগুলো পালন করা হয়নি - আমরা এই এখানে থাকব না, আমাদেরকে অন্য কোন জায়গা দিতে হবে। কালেক্টর নেহেরুকে, তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নেহেরুকে চিঠি পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন যে তাহলে ওনাদেরকে পাঠিয়ে দাও দিল্লীতে। নেহেরুর কাছে ওরা যায়, ওই হরিনারায়ণ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে। ওখানে যেতে ওরা একটু শিক্ষিত একটু মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রত্যেকে যারা দিল্লী যাওয়ার মতো সাহস করে এবং যাদের একটু অর্থনৈতিক বল ছিল - তারা দিল্লী যায়, নেহেরুর সাথে দেখা করে, নেহেরু তাদেরকে এরকম বলে যে - তোমাদের ডিম্যান্ড কি? এবং তারা বলে যে আমরা ওখানে থাকব না, আমাদের শহর লাগোয়া অঞ্চলে থাকব। তাদের কথা অনুযায়ী তাদেরকে শহর লাগোয়া - যেটা যাদবপুরের কাছাকাছি, যেটা যেকোন কলোনি হতে পারে, যেটা গড়িয়াতে হতে পারে - এসব জায়গাতে, পাঁচ কাঠা জায়গা, একটা একতলা বাড়ি এবং ব্যবসা করার জন্য তাদেরকে ছব্বিশ হাজার টাকা করে তাদেরকে নেহেরু সরকার প্রদান করে। এটা কাদের জন্য? এটা তাদের জন্য যাদের মধ্যবিত্ত, যারা মানে তাদের সম্পত্তি দেখিয়ে, মানে ধরো এইখানে একটা গল্প আছে। মানে কিছু ল্যান্ড ট্রান্সফার করা হয়েছে। ট্রান্সফার মিনস্ ল্যান্ড ট্রান্সফার তো করা হয়নি, করা হয়েছে ধরো এখানকার কোন মুসলিম, ভারতবর্ষের কোন মুসলিম সে - তার এখানে অনেক জায়গা জমি ছিল, সে চলে গেছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের কোন হিন্দুর প্রচুর জমি জায়গা ছিল, সে ওটা রেখে এসে এখানে তার

জায়গাটা নিয়েছে। তো এরকম যাদের সম্পত্তি ছিল তাদেরকে নেহেরু সরকার কি করেছে - ওই চব্বিশ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। মানে কাদেরকে? যাদের একটু অর্থনৈতিক বল ছিল। কিন্তু যারা একদম মানে ওখান থেকে মানে নিম্নচর থেকে এসেছে, যারা ওই আমি যেটা বললাম আমার পরিবার, পোদ্দার বাড়িতে থাকতো তাদের নিরাপত্তার জন্য, যাদের একদম কিছুই ছিল না, এখানেও কিছু নেই - তাদের কিন্তু নেহেরু গভর্নমেন্ট চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের ডিস্ক্রিমিনেশন করা হয়েছে। কি ভাবে সেটা? সেটা এরকম গল্পটা - বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এক, ওখানে একটা স্কুল গড়া হবে। অন্যান্য কমিউনিটি যারা আছে, যেহেতু এরা রিফিউজি তাই তাদেরকে এক্সট্রা কিছু ত্রাণ তহবিল দেওয়া হবে। তাদেরকে আইডেন্টিটি কার্ড দেওয়া হবে। তাদেরকে ওই ল্যান্ডটা ম্যাপে দেখানো হবে রিফিউজি হিসেবে। এবং তাদের জন্য রোড তৈরি করা হবে। তাদের জন্য কারেন্ট ব্যবস্থা করা হবে। তাদের জন্য ব্যবসা করার জন্য একটা মার্কেট তৈরি করা হবে। কিন্তু আল্টিমেট কিছু করা হয়নি। কিছুজন ওখানকার যারা বুদ্ধিমান মানুষ তারা কোন কোন জায়গা থেকে কিভাবে তারা, দু-তিনজনকে তো আমিও দেখেছি, কি ভাবে তারা রিফিউজির আইডেন্টিটি কার্ড আসে। তারা কিভাবে করেছে তা নিয়ে আমার কাজের ক্ষেত্রে পরবর্তী কালে আমি দেখব যে কোন দপ্তর থেকে দেওয়া হয়েছে, কিভাবে দেওয়া হয়েছে এবং আমি যখন সরকারি তথ্য খুঁজি তখন দেখি যে ওদের যে ভোটার কার্ড আছে তাতে কিন্তু কলোনি লেখা আছে - জায়গাটার নাম হচ্ছে জয়শ্রী কলোনি। ওই জায়গাটার নাম। কলোনি হওয়া সত্ত্বেও সেটা কিন্তু মানে ল্যান্ডে কিন্তু মানে ল্যান্ড যে ম্যাপ থাকে, সেই ল্যান্ড ম্যাপে কিন্তু কলোনি বলে উল্লেখ নেই। সুতরাং গভর্নমেন্টের যুক্তি কি? গভর্নমেন্টের যুক্তি হল যে আমরা ওদেরকে ল্যান্ড দিয়েছি। কেমন ল্যান্ড দিয়েছি? এবার যারা ওখানে ছিল, ওই ট্যাঙ্ক পুকুরে যারা বসবাস করত বারো বিঘা করে জায়গা দিতে হতো, দশ বিঘা করে চাষবাসের জন্য আর দু বিঘা বসতবাড়ির জন্য। এবং এভাবে ভারত সরকার ভেবেছিল বসবাস করবার মতো নয়, কেউ বসবাস করতে পারবে না, জায়গাটা যখন পড়েই আছে তখন ওরা বসবাস করুক আর জঙ্গল এরিয়া বাঘ-

ভাল্লুক যেকোনো মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে - আমরা বলতে পারব রিফিউজিকে আমরা মানে আস্তানা দিয়েছি, তাদের জন্য এই আমরা প্রোটেকশন নিয়েছি, আমরা সরকার এই এই ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু সেটা দেখা যাচ্ছে যেভাবে ল্যান্ডটা, সেই ল্যান্ডটা একদম মানে লোল্যান্ড এবং প্রচণ্ড লবণাক্ত একটা জায়গা যেখানে শস্য উৎপাদন করা খুবই কঠিন। এখন পর্যন্ত সেখানে চাষবাস করলে আমি নিজেও দেখেছি যখন ধান কখনো কখনো আমি যখন ধান চাড়া রুইতে যেতাম সেখানে ওই বড় বড় গাছের মুড়ো পাওয়া যাচ্ছে মানে বড় বড় গাছের গোড়া যাকে বলা হচ্ছে - তো এরকম একটা জায়গা তাদেরকে দেওয়া হয়। সুতরাং সরকার কাকে দেখল? যাদের একটু অর্থনৈতিক সহায় আছে তাদেরকেই সরকার চব্বিশ হাজার টাকা করে টাকা দিয়েছে, যারা মুভ করতে পারল, যারা সাহস আছে যাদের দিল্লী যাওয়ার মতো তাদেরকে যাদবপুর, বিজয়গর কলোনি, গড়িয়াতে পাঁচ কাঠা করে জায়গা দিয়েছে, এক তলা বাড়ি দিয়েছে। আর যারা ওখানে পরে থাকল তারা ওখানে পরে থাকল। বাঘের সাথে লড়াই, দৈনন্দিন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং চাষবাসের একটা মানে প্রতিকূল ব্যবস্থা - এর মধ্যে তারা সেখানে লড়াই করে করে বেঁচে এসেছে এবং সরকারের যা প্রতিশ্রুতি তার একটাও পালন করা হয়নি। আমি সেটাকে মানে চ্যালেঞ্জ করতে পারি করা হয়নি। সরকার একটাই যুক্তি- সরকার ওদেরকে ওখানে যারা বসবাস করছে, প্রথম যারা গেছিল, চুয়ান্নটা ফ্যামিলিকে তারা বারো বিঘা করে জায়গা দিয়েছে। কেন দিয়েছিল? ওই তারা ভেবেছিল যে এখানে কেউ বসবাস করবে না। আস্তে আস্তে যখন মানুষ বাড়তে থাকল, যখন এরা শুনল যে আমাদের এখানে জায়গা দিয়েছে ভারত সরকার তোমরা চলে আস। ওখান থেকে আস্তে আস্তে এর পরিবার, তার রিলেটিভ, তার রিলেটিভ আস্তে আস্তে যখন দেখল জায়গা কম - ছয় বিঘা, চার বিঘা জায়গাটা এরকম পর্যায়ে নেমে আসে এবং বাষট্টি সালের সেটেলমেন্টে কি করা হয়েছে? ওই জায়গাগুলো যখন চাসবাস করতে পারছে না অনেকেই বিভিন্ন জায়গায়ে চলে যায়। কেন ওখান থেকে দৈনিক জীবন যাপন করার মতো অবস্থা তাদের নেই। চলে যেতে কি হল সেই সেটেলমেন্টের সময় কালেক্টর কি করেছে

ওটাকে লোল্যান্ড বলে মানে যারা গরিব মানুষ যারা জায়গা পেয়েছিল সরকারের থেকে তারা কিন্তু জায়গা হারা হয়েছে। তাদের রায়টের জায়গা আর থাকল না। ঠিক গল্পটা এখানেই মোটামুটি ওদের সঙ্গে ভারত সরকার মানে কি যারা রিফিউজি হয়ে এসেছিল তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে নয়, যাদের অর্থনৈতিক সম্পত্তি ছিল তাদের সঙ্গে একরকম ব্যবহার, আর যাদের একদম কিছুই ছিল না - যারা শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি পেয়ে এবং বাধ্য হয়ে জীবন বাঁচানোর জন্য, পরিবারকে বাঁচানোর জন্য এখানে বাধ্য হয়ে এসেছে - তাদের সাথে একরকম ব্যবহার করেছে মানে ভারত সরকার। প্রতিটি তথ্য রয়েছে আমার সাথে এবং আমি কিছু মানুষের ইন্টারভিউ নিয়েছি। তো তাদেরকে যখন আমি বলি যে - এখন যদি বাংলাদেশে যান আপনি বা আপনার সেই বাংলাদেশের সেই চরিত্র, সেই পরিবেশ, সেই বন্ধুত্ব, খাওয়া দাওয়া, সেই পুকুরের মাছ - আপনি কি ভাবছেন? তাদের... আমি তিনজনের ইন্টারভিউ নিয়েছি, তিনজনেই চোখে জল পড়েছে এবং গলা কাঁপছে। আসল পিকচার হচ্ছে এটা - তারা কোনোমতে এখানে হয়তো ভাল করে থাকতে পারে তারা শুধুমাত্র জীবন বাঁচানোর জন্য এখানে এসেছে।

সৌমিতাঃ আচ্ছা তুমি আমাদেরকে এতক্ষণ ধরে যে একটা সরকারি ডিস্ক্রিমিনেশনের গল্প বললে এবং একটা সম্প্রদায় কিরকম করে লড়াই করে উঠে এসেছে, পাওয়া না পাওয়া, হতাশার কথা বললে - আমাদেরকে যদি একটু বল যে এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তোমার পরিবার তো সেই সুবিধাভোগীদের মধ্যে পরেনি, তারা কিরকম ভাবে, তোমার পরিবারকে তুমি... তোমার পরিবারের কাছ থেকে তুমি কিরকম স্ট্রাগল - এর গল্প শুনেছ? তারা কিরকম ভাবে এই পরিস্থিতিটার সাথে সম্মুখীন হয়েছে?

পিন্টুঃ একটা রিফিউজি চরিত্র কেমন দেখি আমরা? এখন অবধি যেটুকু রিফিউজি চরিত্র দেখছি আমরা, যে তাদের মানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং কোন একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক বলয় বা ক্ষমতা বলয় একটা মানুষকে বা গোষ্ঠীকে রিফিউজি হিসেবে

আইডেন্টিফাই করছে। আমার যেটা মনে হয় যে রিফিউজি কেউ ইচ্ছে করে হয় বলে মনে হয়না কোনোদিন মানে এবং কেউ তার ব্যাক্তিগত ভিটে মাটি ছেড়ে এসে অন্য কোথাও থাকবে এটা তো চায়না। ফলে সে যে রিফিউজি হচ্ছে, রিফিউজি শব্দটা কোথাও থেকে যেন একটা ঘৃণ্য, কোথাও থেকে একটা ডিস্ক্রিমিনেশন, কোথাও থেকে একটা তাচ্ছিল্যর একটা প্রকাশ পায়ে - এই শব্দটার মধ্য দিয়ে। সুতরাং এই শব্দটার মধ্যে আমার একটা সন্দেহ রয়েছে, এ শব্দটাকে অন্য কিছু করা যায় কিনা বা অন্যভাবে দেখা যায় কিনা। যে শব্দটার মধ্য তাচ্ছিল্য থাকবে না, নিচু একটা কনসেপ্ট, ভাবনা চিন্তা থাকবে না। সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমার ফ্যামিলি যেটা মনে করত যে কিছুদিন আগেও বাবার কাছে গল্প শুনেছি, যখন ওই জি প্লটে আসতে আসতে নির্বাচন পদ্ধতি আসলো, প্রশাসন ব্যবস্থা আসলো, তারা ওই জি প্লট আইল্যান্ডের একটা কোনে পড়ে আছে। যখন কোন ওই জি প্লট আইল্যান্ডের কোন উন্নয়নের কোন প্রোজেক্ট আসত বা অর্থ আসত, মানে সাধারন উন্নয়নের মানে জেনারেল ডেভলপমেন্টের যে প্রসেসগুলো যেমন রাস্তাঘাট, টিউব ওয়েল... টোটাল সাতখানা মৌজা আছে ওই আইল্যান্ডে। তাহলে সাতখানা মৌজাতে যদি কুড়িখানা টিউব ওয়েল আসে - তাহলে ইকুয়্যালি যদি আমরা হিসেব করি তাহলে দেখা যাবে যে আমার মৌজাতে একখানা পড়ল কি পড়ল না। যে দরকার নেই। এই চরিত্রগুলো পরিস্কারভাবে দেখিয়েছে। কি ভাবে দেখিয়েছে? আমি কিছুজনের কাছে শুনেছি যারা ওই কমিউনিটি, আমার কমিউনিটি যারা পঞ্চায়েত মেম্বার হয়েছে, তারা হয়তো একদিকে একই পলিটক্যাল চিন্তাতে বিলং করছে কিন্তু তাদের কমিউনিটি হচ্ছে আলাদা। যখন তারা বোর্ডে বসছে মানে উন্নয়ন নিয়ে যে আমারও তিনটে কল মানে টিউবওয়েল পাওয়া উচিত, প্রাইমারি স্কুল পাওয়া উচিত - আর বাদবাকি সাতটি মৌজার যারা যারা পলিটিক্যাল লিডার রয়েছে, ডেভলপমেন্টের মেম্বার রয়েছে তারা এটা নিয়ে স্বীকার করছে না। পাওয়ার দরকার নেই আমাদের, কেন পাওয়ার দরকার নেই? না মানে যেহেতু এদের ভোট সংখ্যা কম, ক্ষমতা সংখ্যা কম, তাই এদেরকে না পেয়ে ভাবে বিভিন্ন রকম মানে এর ভেতরে যে পলিটিক্স থাকে, মানে ডেভলপমেন্টের যে পলিটিক্স

থাকে সেটা হতো। এটা পরিস্কারই চলতো, এর চরিত্র আমি এখানে এসে দেখেছি এখনও দেখা যায়। এবার আমার ফ্যামিলির... আমার বাবা খুব... মানে আমার বাবা হচ্ছে আট ভাই আট বোনের মধ্যে ছোট। তো হয়তো বাবার স্মৃতিতে খুব একটা স্পষ্ট এটা মনে পড়েনা। যেহেতু ছোট একটু আব্দারে থাকতো। কিন্তু ঠাকুমা, জেঠু তারা কি করতেন? বলতেন। সাপলা, আটার জল এবং অন্যের বাড়িতে কাজ করে - যদি এক বেলা কাজ করা যায়, কাজ পাওয়া যেত, যদি কিছু চাল দিত, সেই চালটা নিয়ে এসে কখন ঠাকুমা... হয়তো এমনও হয়েছে যে আসতে আসতে ঠাকুমা কোন জেঠু ঘুমিয়ে পড়েছে বা বাবা ঘুমিয়ে পড়েছে... মানে তারা মানে খাবার আশায় ঘুমিয়ে পড়েছে কখন ঠাকুরদা আসবে চাল নিয়ে। হয়তো ঠাকুমা বাইরে যাচ্ছে আর ওনাদের কাছে আসছে,বাইরে যাচ্ছে ঠাকুমা আর ওনাদের কাছে আসছে, মানে থালা বাসন ধোওয়া রেডি হাঁড়ি রেডি, চাল আর আসছে না। একটা সময় আসলেও সেটা হয়তো প্রয়োজনের তুলনায় অনেকটা কম। যাই হোক, যে একটু বড় সে একটু বোঝে। মেজু জেঠু একটু ভাল বোঝে, সেজো জেঠু একটু ছোট, পিসি একটু ছোট। তাই যারা একটু ছোট তাদের একটু বেশি খাইয়ে দাইয়ে যারা বড়রা তারা একটু জল একটু ভাত খেয়ে ব্যাস ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর দিন আবার যে যার মতন পরিশ্রম করতে চলে গেল। অনেকসময় সাপলা খেয়ে তাদের দিন কেটেছে এবং আটার জল - আটা তো পেত না, আটার জল। যাই হোক একটা সময় আসলো, যেহেতু একদম খাল বিল, একদম নদী বেষ্টিত - প্রচুর মাছ। চাল নেই কিন্তু প্রচুর মাছ। খাবে কি দিয়ে? মাছ খাওয়াই চলল। এই ভাবে আস্তে আস্তে স্ট্রাগল করতে করতে করতে করতে ছেলে মেয়েরা তাদের ঘরে ছেলে মেয়েরা বড়ো হয়। তারা কাজে কর্মে যায়, ওখানে কোন অঞ্চলে কাজ করুক, বাইরে কাজ করুক – আস্তে আস্তে অর্থনৈতিক স্বনির্ভর হতে শুরু করে। অর্থনৈতিক স্বনির্ভর কথার অর্থ হছে যে সেই ক্ষেত্রে ওই রিফিউজি অঞ্চল থেকে একদম খেতে পেত না, যাদের কোন একদম আইডেন্টিটি ছিল না - তারা আস্তে আস্তে আস্তে আস্তে একটা দুবেলা খাবার মতো সংস্থান তৈরি করল। এবং আমি স্কুলে... আমার ক্ষেত্রে তো পরিস্কার মনে আছে - এটা আমি ওপার বাংলা থেকে এসেছি বলে, নাকি

আমার বাবা গরিব বলে কেন আমি জানিনা - যখন খেয়া পেরিয়ে স্কুলে যেতাম, খেয়া পারানোর জন্য একটাকা পঁচিশ পয়সা লাগত। বাবা কিন্তু একটা দিন হয়েছে আমার সেটাও দিতে পারেনি। এবং বাবা খুব গান বাজনা ভালোবাসতো, যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে কুকিং এর চাকরি পেয়েছিল। বাবা করেনি সেটা। বাবা খুব গান বাজনা ভালবাসে, গান করবে, বাড়ি থাকবে সবার আদরে, হাসি-ফুর্তিতে থাকবে যেহেতু সবার ছোট ছেলে। চলে গেছে বাবা সেখানে থাকে, সুতরাং হয়তো এটাও একটা হতে পারে মানে অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণ। কিন্তু যেটাই হয়েছে যে, যেটা বললাম আর কি - একটাকা পঁচিশ পয়সাও আমার বাবা কিন্তু একদিন দিতে পারেনি। পারেনি মানে সেটা প্রত্যেক দিন নয় কিন্তু এক একটা দিন গেছে এরকম। এবং আমার বাবা মায়ের স্বপ্ন ছিল আমায় গান বাজনা শেখাবে, আমি গান বাজনা শিখিও, মানে তিন বছর গান বাজনা শিখি - ক্ল্যাসিকাল, এক বছর ভোকাল এবং দু বছর নজরুলগীতি। আমার মনে আছে আমি কালো জাম, কাঠবাদাম বিক্রি করে সঙ্গীত-জিজ্ঞাসা নামে একটা বই ছিল, সেই বইটা কিনেছিলাম। কিনে গান শেখা শুরু করি। এখনও পর্যন্ত গান চর্চা মাঝে মধ্যে করি, ভাল লাগে। বোনেদের মধ্যে মানে একটু... গানের চর্চা এখনও আছে বাবাও গান চর্চা করে। তো এরকম একটা পরিবার থেকে মোটামুটি আমি নয় ওখানকার যতজন মানুষ আছেন - যারা ল্যান্ড হোল্ডার ছিল না, যারা হেভি স্ট্রাগল করেছে - আমাদের মতো বহু ছেলে মেয়ে ঠিক এটাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য আজকে কেউ খুব ভাল লাগার ব্যাপার - ভাল ভাল জায়গাতে তারা চাকরি করছে, শিক্ষিত হয়েছে, মানে শিক্ষা গ্রহন করবার চেষ্টা করছে, জায়গা কেনার চেষ্টা করছে, স্বনির্ভর হবার চেষ্টা করছে। হয়তো এটা ভাল কি খারাপ - সেটা আলাদা কোশ্চেন।

সৌমিতাঃ আচ্ছা যখন তোমার পরিবার নোয়াখালিতে থাকতো তখন তাদের একটা অর্থনৈতিক স্টেবিলিটি ছিল। কিন্তু এখানে আসার পরে তারা সম্পূর্ণভাবে সেই জায়গাটা হারিয়ে ফেলে। তো কখনো তুমি তোমার পরিবারের কারুর কাছে শুনেছ যে - আমরা ওই পারে যাই হোক কিছুটা খেয়ে দেয়ে থাকতে পারতাম, এখানে

এসে সেটাও জোটে না। এই ক্ষোভটা তুমি বা এই দুঃখটা কোনোদিন তুমি শুনেছ বলে মনে পরে?

পিন্টুঃ একদমই। মানে এটা বহুবারে শুনেছি, বহুবার। কেমন ভাবে শুনেছি মানে যখন আমার জ্ঞান আমার ঠাকুরদা বড়ো পিসি এবং জামাইকে দেখার জন্য খুব আকুল হয়ে ওঠে এবং তখন কোন পদ্ধতিতে তাদেরকে নিয়ে আসা হয়। মনে হয় দালাল পদ্ধতি ছিল। কেউ এক যদি দালালি করত, তারা এপার ওপার করত কিছু মানুষকে টাকার বিনিময়ে। তো বড়ো পিসি এবং বড়ো পিসেমশাই ও তাদের এক ছেলে এবং এক মেয়ে যখন আসে তখন আমার জ্ঞান পরে... ওই পিসে-পিসি-দাদা-দিদি মানে তাদের ঘরের ছেলে মেয়ে - তাদের কাছ থেকে যে কষ্টের কথা শুনেছি, যে যতই তাদের বাবা মা এখানে থাকুক না কেন, বা আমার পিশেমশাই বা ঠাকুরদা যতই এখানে থাকুক না কেন - নিজের জায়গা তো নয়, নিজের হাঁড়ি তো নয়, নিজের ঘর তো নয়, নিজের চাল তো নয়। সুতরাং মানে এবেলা খেলে ওবেলা নিজের উপরে নয় অন্য কারুর উপর ডিপেন্ড করতে পারছে. এই ক্ষোভটা খুব শুনেছি যে আজকে যদি বাংলাদেশে থাকতাম তাহলে বোধহয় এই কষ্টটা হতো না। মানে আহারে এই কথাটা, মানে মাথায় কপালে হাত দিয়ে - কি ভাল যে ছিলাম সেখানে, মানে মোষের দুধ, কচ্ছপ তারপর বিভিন্ন মাছ, এই কাতলা মাছ, এই রুই মাছ, এরকম কাঁকড়া। এরকম গল্প বহু শুনেছি। আজকে তারা সেখানে খেতে পায়নি, এরকম বহু, মানে আজকে তারা খেতে পায়নি এরকম গল্পটা, মানে খাওয়ার জন্যই তাদের কষ্টটা - এটা অনেক শুনেছি, অনেক গল্প শুনেছি এইরকম। এটা যেটা এখানে তারা পায়নি।

সৌমিতাঃ আচ্ছা তুমি বলেছিলে যে দাঙ্গা বিধ্বস্ত একটা সময় তারা এই পারে চলে আসে। এবং সেখানে অনেক মুসলমান পরিবার তাদেরকে সাহায্য করে তাদেরকে আশ্রয় দেয়। তো সেই পরিবারের, তাদের সম্পর্কে কোন কথা, তাদের ভাল কথা, তাদের

মনে করে বা সেই দাঙ্গার সময়কার কোন ডেসক্রিপশন তুমি শুনেছ বলে তোমার মনে পরে?

পিন্টুঃ আমি ঠিক না মানে নামটা ওই মুসলিম ভদ্রলোকের নামটা ভুলে গেছি। কিন্তু তাদের কিছু কিছু কথা মানে আমি ভুলতে পারিনা যেটা আমাকেও খুব হার্ট করেছে। যেমন আমি কোট করতে চাইছি যেটা হচ্ছে কে - আমাদের ডিস্ক্রিমিনেশনের জন্যই মুসলিমরা খেপেছে, মানে আমাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য। আমাদের মানে? আপার ক্লাস হিন্দু ব্রাহ্মিণ জমিন্দার এদের কিন্তু তুচ্ছ তাচ্ছিল্যর জন্য ওখানকার লোয়ার ক্লাস মুসলিম তারা খেপেছে এবং সেটাকে পুঁজি করে কিছু মুসলিম যারা মৌলবি তারা সেটাকে অস্ত্র করে একটা দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করেছে যাতে কে এই বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের তাড়ানো যেতে পারে। মানে পূর্ব পাকিস্থান যাকে বলা হচ্ছে তখন মানে বাংলাদেশ তো তখন হয়নি যাকে বলা হচ্ছে পূর্বপাকিস্তান। ঠিক সেই মুহূর্তে যেটা বললাম যে ওরা বলছে যে... আমি তিনজনের ইন্টারভিউ নিয়েছি খুব এক থেকে দেড় ঘণ্টা, আরও অনেকজন আছে শুনেছি - তো ওই বলছে যে আমরা যে বেঁচে আছি মুসলিমের জন্য। অমুক চাচা, তমুক মামা, অমুক ভাই। তিন থেকে চার জনের কাছে শুনেছি যে এখনও বলে - আহারে অমুক জন কি ভাল ছিল। তিন বছর পরে যে গেছি আমায় তো জড়িয়ে ধরে বাড়িতে নিয়ে এসে না খাইয়ে ছাড়বে না। চাষির সেই কি কান্না, চাষার সেই কি গল্প। ফিরে আসার সময় এত টাকা দিয়েছে আমাকে যাতে কষ্ট না হয়। ছেলে মেয়েকে মানুষ করবে, ছেলে মেয়েরা এখানে থাকলে... এবার মানে এখানে গল্প আছে এরকম একটা যে - জীবন পোদ্দার যিনি, যার সাত বছর বয়সে এখানে এসেছে তার বাবা সোনার ব্যবসায়ী ছিল। ওই বরিশালের একটু শহর ভিত্তিক অঞ্চল যেখানে ওখানে ওরা থাকতো। তাদের সোনার ব্যবসা ছিল। তো যখন আস্তে আস্তে আস্তে আস্তে বিভিন্ন জায়গায় রায়ট হচ্ছে, আস্তে আস্তে উঠে আসছে মানে চর থেকে আস্তে আস্তে রায়তরা উঠে আসছে, এবার শহর লাগোয়া উঠে আসছে। ঠিক ওই সময় জীবন বাবুর বাবার একজন খুব ফ্রেন্ড মুসলিম, মানে নাম কি গোত্র কি জানা নাই, কিন্তু

সেটা হচ্ছে ফ্রেন্ড - ফ্রেন্ড মিনস্ চাচা। সেই চাচা মানে এর বাইরে কোনোদিন খাবার নেই, ওর হাঁড়ি আছে। ওর বাড়িতে কোনোদিন খাবার নেই তো এর হাঁড়ি আছে - সম্পর্কটা এরকম ছিল। এবারে যখন এখানে একটু মহাজনের মতো ছিলেন মানে সোনার ব্যবসা করত মানে মোটামুটি একটু মহাজন - অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর। এক্ষেত্রে হল কি - আস্তে আস্তে এর প্রতি ক্ষোভটা বাড়ে, যে একে তাড়াতে হবে। হয়তো এর দ্বারা অনেকে, অনেক হিন্দু মানে লোয়ার ক্লাসকে নিরাপত্তা দিতে পারে যে আমি আছি। অর্থনৈতিক দিক থেকে বা যেকোনো ভাবে হয়তো নিরাপত্তা দিতে পারে। এর মধ্যে একটা গল্প আছে এবং এর জন্য একে এবার আইডেন্টিফাই করা হল। একে আগে হয় মারা হবে নাহলে তাড়ানো হবে। সেটা ওই যে চাচা সে শুনেছে। একদিন ঠেকাল, দুদিন ঠেকাল, তিনদিন ঠেকাল - কিন্তু যেদিন পারল না সেদিন বলল যে - জীবনবাবুর বাবার নাম আমি ঠিক ভুলে গেছি - তো বলল যে তুই চলে যা ছেলে মেয়েকে নিয়ে, আর বাঁচবি না এখানে। আমি আর তোকে পারব না বাঁচাতে। তখন জীবন বাবুর বাবা বলছেন যে - চাচা আমার তো অনেকের কাছে টাকা পাব আর অনেকে আমার কাছেও টাকা পাবে। তখন চাচা বলছে - এই মোহ ছাড়। আগে জীবনটা। আশা করি সারা জীবন এটা থাকবেনা। যখন এই রায়ট সুস্থ হয়ে যাবে, হয় আমার কাছে তুই আসবি দেখা করতে, নয় আমি তোর কাছে যাবো দেখা করতে। তিন বছর পর ওনার বাবা গেছিল। তখন রায়টটা আস্তে আস্তে আস্তে আস্তে কমে আসে বা সেই বাংলাদেশের খোলা বাতাস, সেই চাচা, সেই পরিবেশ, আত্মীয় স্বজন - সেটা পাওয়ার জন্য সে হয়তো ব্যাকুল হয়ে উঠছিল তাই তখন কোন কিছু থাকলেও সে সেটাকে রিস্কি হিসেবে চলে গেছিল মানে ওদের সাথে দেখা করার জন্য। তো সেখানে দেখা হবার পরে মানে প্রচণ্ড জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি - বউমা কেমন আছে? ছেলে কেমন আছে? স্কুলে ভর্তি করেছিস কিনা? ভাল আছে কিনা? ও এটা খেতে ভালবাসত, ওখানে পাচ্ছে তো খেতে? জীবন বাবু সাপলা আর চিংড়ি মাছ খেতে খুব ভালবাসত মানে ওখানে খাইয়েছে। আর সাপলা আর চিংড়ি মাছ যেমন - মানে উনি যেহেতু ছোট ছিলেন আর ওনার বড়ো বাড়ি ছিল মানে হিন্দু বড়ো বাড়ি

ছিল এবং উনি বাড়ির মধ্যে ছোট মানে একটাই ছেলে বেসিক্যালি আশে পাশে যারা থাকতো তারা একটু বড়ো ছিল বয়সে। সে খুব আব্দারে ছিল মানে সাপলা আর চিংড়ি মাছ এর তরকারি হলে ওকে দিতেই হবে। দিতেই হবে মানে ভালবেসে দিয়ে যাবে। ওর বাড়িতে হলে ও নিয়ে যাবে বা ওকে দিয়ে আসবে এরকম গল্পটা। তো চাচা খবর নিচ্ছে - জীবনের শরীর কেমন আছে? সাপলা আর চিংড়ি পাওয়া যাচ্ছে তো সেখানে? এই যে গল্পটা, এই যে সম্পর্কটা - এটা আমার কাছে খুব হার্টে ধরে গেছে। সুতরাং এখানে আমাদের প্রশ্ন যে - যে দাঙ্গাটা লেগেছে, যে রায়টটা লেগেছে - কিসের জন্য লেগেছে, কারা লাগিয়েছে, কেন রিফিউজি হতে হল, সে কি নিজের দোষে রিফিউজি হতে হয়েছে, না রাষ্ট্রের মানে যে জাঁতাকল - রাষ্ট্রের যে ক্ষমতা লিপ্সু, না কোন ক্ষমতাবান যে গোষ্ঠী ক্ষমতা বলয় তার মধ্যে পরে গিয়ে সব সাধারন মানুষগুলোর জীবন আজকে যে রিফিউজি নামে শব্দে পরিণত হয়েছে - আমার কাছে এরকম কয়েকটা প্রশ্ন খুব ঘোরাঘুরি করেছে।

সৌমিতাঃ আচ্ছা তোমার এই কথার টান ধরেই আমি বলছি যে তাহলে দেশভাগ বলতে তুমি তোমার পরিবারের কাছে যা শুনেছ তা সমস্ত শোনার পরে তোমার কাছে আজকে দেশ ভাগ বলতে তুমি কি বোঝো?

পিন্টুঃ দেশ কিসের জন্য? দেশটাই বা কি? বা দেশভাগ তাও বা কি? আমার মনে হয় এটা পুরোটাই সোসাইটির... মানে আমি কোন স্টেট, বর্ডারকে এখানে ফাংশনে আনছি না। মানে আমি যেটা ভাবছি মানে আমি যেটা ফিল করি ওদের কথা এবং আমার চোখে দেখা - এগুলো সমস্তই কিছু একটা... জাস্ট এলিট শ্রেণী মানে যারা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ক্যাচ করে - তাদেরই এটা একটা কাজ সুস্থ মস্তিষ্কে। আজকে যেই মানুষটা বাংলাদেশে থাকতো, সে যেইভাবে থাক না কেন - যার জন্মও সেখানে, যে রায়ট হয়েছে, যে দেশভাগ হয়েছে এবং যে রায়টের ফলে আজকে ভারতবাসী হয়ে গেছে, যে হিন্দু মাসটা যে সে মুহূর্তে যারা ভারতবাসী হয়েছে - সে যদি প্রশ্ন করে নিজেকে, ক্যান আমাকে বাংলাদেশ ছাড়তে হল?

বাংলাদেশটা কি বা ভারতবর্ষটা কি? ক্যান আমাকে বর্ডার পেরিয়ে, বর্ডারের আইডেন্টিফাই দিয়ে রিলিফ ফান্ড, রিফিউজি ক্যাম্পে বর্ডারের আইডেন্টিটি দিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করতে হচ্ছে? এটা কি মানে আমার দোষ? নাকি যদি এটা গল্প থাকে যে সার্বিক একটা সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন আছে। সরকারের প্রয়োজন আছে, সোসাইটির প্রয়োজন আছে - তাহলে ওর কাছে সোসাইটির মানে কি? ওর কাছে রাষ্ট্রের মানে কি? একটা রিফিউজির কাছে ল্যান্ডের মানে কি? আমার কাছে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো যখন খুঁজে বেড়াই, আমার কাছে এটাই মনে হয় যে - একটা ক্ষমতাবান শ্রেণী বা এলিট শ্রেণীর কাজ সিদ্ধ করার পদ্ধতি। রাষ্ট্র, দেশভাগ, স্বাধীনতা মানে ঠিক এই মুহূর্তে আসছে না, যাই হোক... মানে আমার কাছে প্রশ্নটা এটাই - এদের কাছে এই প্রশ্নগুলোর মানে কি? সে কি দোষ করেছিল? তার সন্তান কি দোষ করেছিল? আমি যদি প্রশ্ন করি - আমি কি দোষ করেছিলাম? এর উত্তর কে দেবে? স্টেট দেবে আমাকে? স্টেট তো দিয়েছে বললাম - যেটা নেহেরু গভর্নমেন্ট কি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল আর কি করেছে। আমরা বলতে পারতাম না আমরা জাতে পাটনি ছিলাম, লুকিয়ে যেতাম। পাটনি বললে মার খেতে হতো। আমাদের সংস্কৃতি নোংরা ছিল ওদের কথা অনুযায়ী। আমি জানিনা সেটা কি সংস্কৃতি? ক্যান নোংরা? কিসের ভিত্তিতে নোংরা, কিসের ভিত্তিতে কালচার, কেন আমরা অ্যাগ্রেসিভ, কে অ্যাগ্রেসিভ করেছে আমাদের - এই প্রশ্নের অ্যান্সার কে দেবে আমাকে?

সৌমিতাঃ আচ্ছা তুমি বলছিলে যে এখনও তোমার পরিবারের কিছু সদস্য বাংলাদেশে আছে। তো তাহলে বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের মধ্যিখানে যে বর্ডারটা আছে তার রিলিভ্যান্সটা কোথায় আজকে তোমার কাছে দাঁড়িয়ে? কারণ তোমার পরিবারের একটা অংশ তো এখনও সেখানে থাকে। তো কি রিলিভ্যান্স বর্ডারের, মানে তোমার পরিবার যখন ওইপারে আছে অথচ মাঝখানে একটা বর্ডার... এই বর্ডারের গুরুত্বটা কি তোমার কাছে?

পিন্টুঃ বর্ডার, স্টেট আমার কাছে একটা বস্তুগত চিন্তাধারা। আমি তরণী দাস যিনি হচ্ছে আমার বড়ো পিশেমশাই, যার কথা কি বললাম একটু আগে আমার ঠাকুরদা ঠাকুমার চার ছেলে চার দেখেছে এবং এক প্রকার ওই মুক্তিযোদ্ধা যারা ছিলেন তাদের সাথে কথাও বলেছেন এবং তাদেরকে খাবার দাবারও অনেক সময় ভয়ে হোক, ভাল জায়গা থেকে হোক দিয়েছে। বাড়ি থেকে খাবার দাবার নিয়ে গিয়ে। তারা বুঝতেও পারেনি এরা কারা। তো সেই ধরনের কিছু মানুষকে আমি ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম যাদের মধ্যে তরণী দাস আমার পিশেমশাই, মানে তরণী দাস আমার পিশেমশাই। তার এখনও পর্যন্ত দুই ছেলে আর এক মেয়ে বাংলাদেশে। ঠাকুরদা ঠাকুমা নিয়ে আসে ওদেরকে যে বড়ো মেয়ে জামাই কেমন আছে একটু দেখব ওদেরকে চোখে এইটা বলে। কিন্তু এটা দালালকে ধরে নিয়ে আসে এবং তার জন টাকাও দিয়েছিল তিন হাজার টাকা চার হাজার টাকা তখনকার দিয়েছিল যাতে খরচটা ওদেরকে বহন করতে নাহয়। যাওয়ার জন্য কিন্তু ঠাকুরদা চায়নি যে এরা যাক। আমার কাছে থেকে যাক এটাই চেয়েছিল। কারণ ঠাকুরদা ঠাকুমা চেয়েছিল আমার বড়ো জামাই বড়ো মেয়ে আমার কাছে থাক আমি তাদেরকে চোখে দেখব। তাহলে বড়ো জামাই আর বড়ো মেয়ের ছেলে মেয়ে যারা ওখানে থেকে গেছে তাদের মানুষেরা কি বলছে? যখন তাদেরকে জিগ্যেস করি তারা এই বলছে যে - কিভাবে যে জীবনে ফেঁসে গেলাম, একটু চোখের দেখার জন্য আমার কি কষ্ট হচ্ছে মনটা ছটফট করছে - কিভাবে যে পাব পাব, দেখনা তুমি তো শিক্ষিত ছেলে যে আমাদেরকে ওপারে নিয়ে যেতে পার কিনা। এবং যখন তারা ফোনে কথা বলে মানে একটা কান্নার শব্দ আমি শুনি আর কি যে মা তোমার বড়ো নাতনি বিয়ে দেওয়া হয়েছে, ও খুব ভাল আছে, ও প্রেগন্যান্ট, ওর ছেলেটা স্কুলে যাচ্ছে,আস্তে আস্তে হাঁটছে, তোমাদেরকে তো আর চেনে না, তোমরা যে আসলে যে কি করবে, কবে যে তোমরা আসবে - এখনও তারা আশায় আছে যে তারা বাবা মা কে তারা দেখতে পাবে, ওখানে যারা আছে যে ছেলে মেয়ে। এবং আমার বড়ো পিসি বড়ো পিসেমশাই প্রায় এখন আশির উর্দ্ধে বয়স এখন হয়ে গেছে দুজনেরই। স্মৃতিশক্তি হারিয়ে যাচ্ছে। জানে আমি শহরে পড়াশুনা করি, যদি তাদের একটু

ভিসা করিয়ে দিতে পারতাম। তারা যদি একটু চোখে দেখে পারত ওদেরকে। বা পারলে এখনও অব্ধি এখানে যেটুকু সংসার আছে - ওই যে একটা ছেলে মেয়ে, মেয়ের ঘরে একটা মেয়ে আর ছেলের ঘরে দুটো ছেলে - সবাইকে নিয়ে চলে যেতে পারলে সেখানে তারা বাঁচে। এখনও পর্যন্ত জায়গাটা ঠিক এই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

সৌমিতাঃ আচ্ছা তোমার মতে তাহলে তোমার দেশ কোথায়?

পিন্টুঃ দেখ মানে কঠিন প্রশ্ন মানে আমার দেশ কোথায়। ব্যাপারটা আমার কাছে এরকম আমি আগেও বলেছি যে আমার কাছে দেশ, দেশভাগ, রাষ্ট্র, বর্ডারটা কি... আমি যখন একটি রিফিউজি ছেলে হিসেবে সোসাইটিতে প্রতিষ্ঠা হই এবং তার জন্য আমি যখন স্কুলে যাই, খেলতে যাই, বন্ধুদের সাথে যখন খেলাধুলা করি তখন যখন এ কথাটা শুনতে হচ্ছে, সোসাইটির কিছু মানুষ দ্বারা আমি যখন ডিস্ক্রিমিনেশন হই, যারা কথা দিয়ে কথা রাখেনি, প্রতিশ্রুতি যখন ফেল করেছে, স্টেট ফেল করেছে, এলিট সোসাইটি আমাদেরকে বিভিন্ন সময় ডিস্ক্রিমিনেশন করেছে, সোসাইটির কাস্ট, ক্লাস, কালচারে সমস্ত দিক দিয়ে এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এবং যার জন্য এগুলো হয়েছে সেই স্টেট, সেই দেশভাগ, সেই বর্ডারটাকে আমি কতটা মানি, কতটা বিশ্বাস করি প্রথমে আমার প্রশ্ন সেটাই।

সৌমিতাঃ আচ্ছা তুমি প্রথমে আমাদেরকে বলেছিলে যে ওপার বাংলার মানুষ হিসেবে আচার বিচার খাদ্যাভ্যাস আলাদা। তো সেই আলাদাটা কিরকম ভাবে, মানে সেই আলাদাটা কি এবং কিরকম ভাবে তোমাদের নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে সেটাকে মেইনটেন করেছ যদি একটু বল আমাদের।

পিন্টুঃ এটা তো খুব মজার গল্প। মানে খাবার দাবার তো মোটামুটি আমি যেরকম জানি যে আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা ডমিনেট করি অনান্য

কমিউনিটি. অনান্য কমিউনিটি মানে মেদিনীপুর থেকে যারা এসেছিল তাদেরকেই চিনি। মানে আমাদের বিপরীত কমিউনিটি মানে মেদিনীপুর কমিউনিটি তাদেরকে দেখি। তা আমরা জানি যে আমরা আরস খুব ভালবাসি, বিভিন্ন রকম মানে - গাছের মুড়ো থেকে শুরু করে গাছের পাতা অবধি আমরা খাই। বিভিন্ন রকম মানে পদ্ধতিতে আমরা বেসিক্যালি খেতে পারি সেটাকে। চিংড়ি, ইলিশ থেকে শুরু করে চিংড়ির শুঁড় পর্যন্ত খেতে পারি। বা বিভিন্ন রকম পদ্ধতিতে করে। হয়তো আমরা যখন খাই সেটাকে চিংড়ি মাছ, সাপলা, কচু, কচুর যে শিকড় থাকে সেটা পর্যন্ত, কচুর ডাঁটা যেটা - এগুলো যখন বিভিন্ন পদ্ধতিতে খেতাম - তখন পাশের বাড়ির যারা যেটা আমি আগে বললাম যে মেদিনীপুরের কমিউনিটির মানুষ। হয়তো কোন বউদি আসলেন বা মাসিমা আসলেন তারা চেয়ে থাকতো - এটা আবার কি? খায় নাকি? খেয়ে দেখি তো একটু। যদি ভাল লাগে তো ভাল টেস্ট, আর যদি ভাল না লাগে তো মুখে ভেংচি দিয়ে - এটা নোংরা খাবার দাবার, স্বাভাবিক বাংলাদেশ থেকে এসেছে, রিফিউজি কমিউনিটি তো হবেই। এটা একটা থাকতো, এটা আমি ছোটবেলায় দেখেছি বা এখনও দেখি। একটা মাছ আছে লটে মাছ - আমি জানিনা কেউ চেনে কিনা, তারপর নিহারি মাছ আমাদের কমিউনিটি প্রচণ্ড খায়। আর সেটা আমারও খুব টেস্টফুল. সেটা যখন খেতাম, সেই মাছটার চেহারা যেমন, রান্না করবার পর যেমন, মানে রান্না করলে অন্য কমিউনিটি প্রচণ্ড ঘৃণ্য একটা ব্যাপার - এটা আবার খায় নাকি। এখন সত্যি কথা বলতে গেলে, আমাদের খাওয়াটা, ওই মাছটা আমরা মার্কেটে আর পাইনা। পাইনা মানে অন্যান্য কমিউনিটি কিনে নিচ্ছে। শুঁটকি মাছ মানে আমি যেটা জানি যে বাঙাল কমিউনিটি খায়। খুব সত্যি বলতে আমরা মার্কেটে গিয়ে পাইনা আজকাল। লতি - লতি মানে কচু গাছের শিকড় যেটাকে বলা হচ্ছে সেটা আর পাইনা। এই ধরনের কিছু কিছু জিনিস ইউনিক মানে যেগুলো আমরা বাংলাদেশ কমিউনিটি খেত, সেটা আর এখন মিক্সড হয়ে গেছে। মানে কোনটা আমাদের আর কোনটা ওদের। মানে হয়তো জানি এটা আমাদের খাবার, আমাদের থেকে ওরা ক্যাচ করেছে - সেটা ভালর জন্য হোক, খারাপের জন্য হোক, পুষ্টিকর হোক - এটা হয়েছে।

সৌমিতাঃ আর পুজো আচ্চা বিয়ে এই ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানের নিয়ম কানুনগুলো কি কোনোভাবে আলাদা পশ্চিমবঙ্গ বাসীদের থেকে? বা তোমরা কিরকম ভাবে সেটাকে রিটেন করেছ?

পিন্টুঃ প্রথমত আমি একটা কথা বলি যে আমি যেটুকু দেখেছি মানে যারা ওপার বাংলা থেকে এসেছে ছোটোবেলায় তো ওই কমিউনিটির বাইরে আমি যেতে পারিনি। মানে অন্য কোন কমিউনিটির বিয়ে, মুসলিম কি মেদিনীপুরি মানুষ দেখতে পাইনি, জানতাম না। আমাদের কমিউনিটির মানুষের বিয়ে যেটা দেখেছি কি সামাজিক অনুষ্ঠান যদি বিয়েটাকেই ধরি আমি - একটা খুব হাদিত্য পূর্ণ সম্পর্ক দেখতাম। মানে সবাইকেই ডাকতে হবে। মানে আমাদের বাড়িতে টাকা নেই, অসুবিধা নেই, যে অন্য একজন টাকা দিচ্ছে সেটা আমি শোধ করে দেব - এই বিশ্বাসটা তখন ওদের মধ্যে ছিল, এইটা এখনও আছে। তো বিয়ের যে ওই... বিয়ের সময় কনেকে যখন বিভিন্ন গান করা বা কুলো সাজান বা এবং যখন বরের বাড়িতে যে তত্ত্ব নিয়ে যাওয়া এবং মেয়ের বাড়িতে যে তত্ত্ব নিয়ে আসা - এর চরিত্রগত অনেক পার্থক্য আছে। কিছু আমরা মনে করতাম তোমাদের এমনি করা হচ্ছে আমাদের তো এমন করা হয়না। এ বলে এটা তো কোন নিয়মই না, তোমাদের এতো কোন কালচারের মধ্যেই পরেনা। তোমরা তো নিজেরা তৈরি করে নিয়েছ। কিছুই তোমাদের কালচার নেই, ইউনিক কালচার পূর্বপুরুষের, তোমরা তো ওপার বাংলা থেকে এসেছ, কোন আত্মপরিচয় নেই - তোমরা নিজেদের মত করে তৈরি করে নিয়েছ। সেটা হলেও আমাদের ভাল লাগত, আমাদের কালচার হোক, বা যেই হোক যা দেখেছি সেটা হলেও ভাল লাগত। মানে কালচার ঠিক, ইউনিক ছিল, অবিভিয়াসলি ইউনিক, ছিল সামাজিক প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে।

সৌমিতাঃ কি কি ধরনের নিয়ম মানা হতো তোমার মনে আছে সেটা?

পিন্টুঃ অ্যাকচুয়ালি সেটা খুব মানে খেয়াল করা হয়নি। যেটা যেমন আমি বললাম মানে কনের বাড়িতে বিয়ের আগের দিন অধিবাস - অধিবাসটা আমাদের যেভাবে জাঁকজমক করে করা হতো সেটা আমি আদার কমিউনিটির মধ্যে দেখিনি। হয়তো দেখার সুযোগ পাইনি, আমি জানিনা অ্যাকচুয়ালি কালচারটা কি। আমাদের কমিউনিটির মধ্যে বিয়ের আগের দিন অধিবাসটা খুব ইম্পরট্যান্ট, মানে খুব এনজয়, আমরা যখন ছোট ছিলাম, সমস্ত বুড়ো মানুষ কুলো নিয়ে বসে, মাটির কি বলে ধুনুচি বা ওই মাটির বাতি তৈরি করে সেখানে তেল দিয়ে তুলো দিয়ে পাকিয়ে, ধান দুব্ব্য দিয়ে যে প্রসেসটা খুব এনজয় করতাম এবং গান গেয়ে গান গেয়ে গান গেয়ে গান গেয়ে তারা যে যে গানগুলো গাইত - এটা আমার কাছে খুব ইম্পরট্যান্ট, খুব মজা লাগত। এটা খুব ইউনিক কালচার, ওই মানুষদের একদম ভেতরের সংস্কৃতি বলে মনে হতো। এবং প্রত্যেকে করত এটা।

সৌমিতাঃ আচ্ছা আরেকটা যেটা যে তুমি বলছ যে অনেক সময় তোমরা যেখানে থাকতে সেখানে অনেক কথা মানে তোমরা ওপার বাংলা থেকে আসা যে সম্প্রদায়টা সেটা বাদ দিয়ে আরও অনেক কয়টা কমিউনিটি ছিল। যদি একটু বলতে আর কারা কারা ছিল আর তাদের সাথে তোমাদের সম্পর্কটা?

পিন্টুঃ বেসিক্যালি হাওড়া আর মেদিনীপুরি এই দুটোই বেশি ছিল, আর যদি বলি পাথরপ্রতিমাতে তাহলে পাথরপ্রতিমা তো বড়ো একটা ল্যান্ড - যেটা আমি বললাম যে প্রশাসনিক ভাবে সুন্দরবনের সব থেকে বড়ো হচ্ছে পুলিশ স্টেশন হচ্ছে পাথরপ্রতিমা। এবং যার বারোখানা আইল্যান্ড নিয়ে একটা প্রশাসনিক স্তর গড়ে উঠেছে। তো এখানে কিছু উড়িষ্যার মানুষও রয়েছে কিন্তু সেটা দেখা যায়না। কিন্তু বেসিক্যালি হাওড়া আর মেদিনীপুরি এবং ওপার বাংলা থেকে এসেছে যারা বাঙাল যাদেরকে বলে - এই তিনটে কমিউনিটি আমি দেখেছি।

সৌমিতাঃ এই যে তুমি আমাদেরকে এই গল্পগুলো বললে একজন ওই কমিউনিটি ইনসাইডার হয়ে দেখেছ, ছোটবেলা থেকে বাড়ির কাছ থেকে শুনেছ, এবং সেখানে যে একটা লড়াইয়ের গল্প, ওখান থেকে আসা এখানে সেটল্ করা এবং সরকারি ডিস্ক্রিমিনেশনের সাথে লড়াই করা - এই তোমার এই শোনা গল্পগুলোর থেকে তুমি কি কি গল্প তোমার পরবর্তী প্রজন্মকে শোনাতে চাও?

পিন্টুঃ প্রথমত আমি এবার আমার ফিল্ড ওয়ার্কের ক্ষেত্রে যেটা বললাম, আগেও বলেছি এখনও বলছি - আমাদের কমিউনিটিতে একজন, ওখানে যে কমিউনিটি, মানে ওই যে ছোট অঞ্চলে একজন এম বি বি এস ডাক্তারি পড়ছে, ভাগ্নে - সম্পর্ক ভাই। আরেকজন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অডিটর, কেউ চার্টার্ড হয়েছে - ওই রিফিউজিদের ছেলেমেয়ে। কিন্তু সোস্যাল সাইন্স নিয়ে বা এই ধরনের গবেষণা কেউ করেনি, স্কিপ করে গেছে এই জায়গাটা - যে আমাদের কি পাওয়া উচিত, কি পায়নি। কেন পায়নি, কারা দেয়নি আমাদেরকে। এই প্রশ্নগুলো একটু আমার মনে হচ্ছে যেহেতু আমি সোস্যাল সাইন্স নিয়ে, আমার গবেষণার বস্তুটা সোস্যাল সাইন্সের মধ্যে দিয়ে দেখার চেষ্টা করছি - পরিবার, কমিউনিটি, কালচার, ইকনমিক সোর্স, পলিটিক্যাল ইকনমি - এই জায়গাগুলোর উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমি তখন এই মানুষগুলোর বিষয়গুলো খুঁজে পাচ্ছি। এবং যখন আমি অন্যান্য কিছু শিক্ষিত মানুষ যখন সেগুলো বলছে, মানে আমাদের কমিউনিটির তারা একটু উদ্যোগী হচ্ছে - আমাদের এই দাবি-দাওয়াগুলো নিয়ে আমরা একটু মুভ করব, একটু লড়াই করব। এটা একটা আমি যেমন জানাতে চাইছি এবং এটাও জানাতে চাই যে রিফিউজি মানে শুধু দণ্ডকারণ্য বা মরিচঝাঁপি নয় - একদম প্রত্যন্ত একটা লোল্যান্ডেতে একদম সুন্দরবনে, একদম বে অফ বেঙ্গল স্পট এ. জি প্লট নামক যে আইল্যান্ডটা রয়েছে পাথরপ্রতিমা থানার অধীনে সেখানে একটা মধ্যবিত্ত মৌজাতে রিফিউজিরা বসবাস করে। আমার ঠিক জানা নেই এখনও পর্যন্ত মানে শিক্ষা জগতে এর চর্চা হয়েছে কিনা, আমার ঠিক জানা নেই। তো এটা আমি একটু তুলে ধরার চেষ্টা করব। মানে শিক্ষা জগতে আরও কি ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে,

মানে বেসিক্যালি এই মানুষগুলোর পলিটিক্যাল ইকনমি কেমন ছিল, তাদের সাথে কিরকম পলিটিক্স হয়েছে এটা আমি এখানে যেমন আমি বলছি এর পরবর্তী সময় আমি কিছু মানুষকে নিয়ে লেখালিখি করার চেষ্টা করতে পারি বা করব।

সৌমিতাঃ এবং তুমি তোমার পরিবারের মধ্যে এই গল্পগুলো যেগুলো তুমি বললে আর কি পরবর্তী প্রজন্মকে কেন বলতে চাও? পরিবারের মধ্যে।

পিন্টুঃ যেকোনো পরিবারের বা আমিও শুনেছি প্রত্যেকের হিউম্যান বিং হিসেবে যতগুলো ফ্যামিলি আছে পৃথিবীতে প্রত্যেকের পূর্ব পুরুষ, পরিবারের ইতিহাস কোন না কোন ক্ষেত্রে গল্পের মধ্যে দিয়ে উঠে আসে। আমি জানাব এই কারণে যে, আমি একটাই কথা বলব যে আমার পরিবার কিভাবে এখানে এসেছে, কেন এসেছে, এবং সেই কেনটার উত্তরটা কি? এবং সেই কেনর জন্য দায়ী কে? তোমাদেরকে কি করা উচিত আর এই কেনটাকে তোমরা কিভাবে দেখবে? আমি এভাবে দেখতে চাইছি।

© 2016 Goethe-Institut e.V.– all rights reserved